# ভূমিকা

কয়েক বছর আগের কথা। পবিত্র হারামাইন জিয়ারতের সময় আমি ১২ খণ্ডের বিশাল কলেবরের একটি গ্রন্থ দেখতে পাই। গ্রন্থটির নাম, 'নাজরাতুন নাইম ফি আখলাকির রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'। গ্রন্থটিতে শুধুই নবিজি সা.-এর চরিত্র সংক্রান্ত আলোচনা এসেছে, বিষয়টি তা নয়; বরং সেটি চরিত্র সংশ্লিষ্ট একটি বিশ্বকোষের মর্যাদা রাখে। গ্রন্থটি বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী কয়েকজন আলেমের এক অনবদ্য টিমওয়ার্ক, যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পবিত্র কাবার ইমাম ও খতিব সালেহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হুমাইদ এবং 'দারুল উসিলা'র পরিচালক আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে মুলাওয়িহ। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড মূলত সুদীর্ঘ ও বিস্তৃত একটি ভূমিকা। তাতে নবিজির সীরাতের আলোচনার পাশাপাশি আরো যেসব বিষয় আলোচনা হয়েছে তা হল,

- ❖ গ্রন্থটির লক্ষ-উদ্দেশ্য ও রীতি-শৈলী,
- ❖ মানুষের জীবনযাত্রা,
- ❖ মানব-হৃদয়,
- ❖ বিপদ ও মানবিক বিবেচনায় ঈমানি জীবন,
- ❖ ইসলামে চরিত্রের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব,
- ❖ ইসলামি চরিত্রের গুণাগুণ,
- ❖ ইসলামি চরিত্রের উৎস ও বিধি-বিধান,
- ❖ চারিত্রিক শিক্ষায় ইসলামের বৈশিষ্ট্য, তার মাধ্যম ও উপকরণ
- ❖ এবং 'নববি সীরাত' শিরোনামের অধীনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নবিজি সা.-এর পূর্ণ জীবনী।

দ্বিতীয় খণ্ড থেকে গ্রন্থটির মূল আলোচনা শুরু হয়েছে। তাতে চারিত্রিক বিষয়গুলো দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ৮ খণ্ডে উৎকৃষ্ট গুণাবলি আর ৩ খণ্ডে নিন্দনীয়

গুণাবলির আলোচনা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো সাজানো হয়েছে আরবি বর্ণমালার ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী। সবশেষে দ্বাদশ খণ্ডে রয়েছে বইটির সূচিপত্র।

গ্রন্থটির আলোচনার ধরন নিম্নরূপ :

১. প্রতিটি চরিত্রকে নির্ধারিত শিরোনামের অধীনে চিত্রায়িত করে তার আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ তুলে ধরা হয়েছে।
২. উক্ত চরিত্রের মূলধাতু কুরআনুল কারিমের যত আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে, তা উল্লেখ করা হয়েছে।
৩. যেসব হাদিসে উক্ত চরিত্র বিষয়ক সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে, তা উদ্ধৃতিসহ দেওয়া হয়েছে।
৪. এরপর সেসব হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে তা ইঙ্গিতপূর্ণভাবে আলোচিত হয়েছে।
৫. নবিজি সা.-এর পবিত্র জীবনীর সাথে সম্পৃক্ত উক্ত চরিত্র বিষয়ক দু-একটি ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে।
৬. উক্ত চরিত্রের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম রা., মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও বুজুর্গ-মনীষীগণের উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে।
৭. উত্তম চরিত্রের উপকারিতা এবং নিন্দনীয় চরিত্রের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

গ্রন্থটি অধ্যয়নের পর আমার মনে উর্দু ভাষায় তার অনুবাদ করার তীব্র আগ্রহ জাগে। তাই কিছু সম্পদশালী প্রকাশকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেষ্টা করি। কিন্তু মণিমুক্তোয় ভরা এই বিশাল ভাণ্ডার তারা কাঁধে তুলে নিতে সাহস দেখাননি। আনুমানিক বছর তিনেক পূর্বে 'রোজনামাহ ইসলাম'-এর ব্যবস্থাপনা বোর্ড 'খাওয়াতিন কা ইসলাম' পত্রিকায় 'দরসে কুরআন ও হাদিস' বিভাগে আমাকে লেখার অনুরোধ করে। আমি সোৎসাহে তাদের অনুরোধ গ্রহণ করি। বাহ্যিকভাবে যদিও আমি তাদের অনুরোধ রক্ষা করেছিলাম। কিন্তু বাস্তবে এখানে ছিল আমার পুরোনো ইচ্ছা পূর্ণতা পাবার সুযোগ। যেন 'নাজরাতুন নাইম'-এর বিষয়বস্তু থেকে উর্দু ভাষাভাষীগণ সহজেই উপকৃত হতে পারেন।

পূর্ণ গ্রন্থটির অনুবাদ আমার মতো দুর্বল মানুষের পক্ষে অসম্ভব ছিল। এছাড়া সাপ্তাহিক একটি ছোট্ট পত্রিকার পক্ষে তা প্রকাশ করা ছিল আরো অধিক জটিল। তাই আমি বিভিন্ন দায়িত্ব ও ব্যস্ততাকে সামনে রেখে উক্ত গ্রন্থটির পরিশুদ্ধিমূলক ও চরিত্রমূলক বিষয়গুলোকে সংক্ষিপ্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

আমি প্রত্যেক সপ্তাহে একটি করে শিরোনাম অধ্যয়ন করতাম। আর পাঠক পাঠিকার সামনে তার সারাংশ তুলে ধরতাম। এই ধারাবাহিকতাকে আল্লাহ তাআলা অধিক পরিমাণে কবুলিয়াত দান করেন। ফলে অনেক বাড়িতে ও মজলিসে তা পাঠ করা শুরু হয়। কয়েকজন খতিব সাহেব আমাকে জানিয়েছিলেন যে, তারা উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে তাদের মসজিদে দরস দিয়ে থাকেন এবং জুমআর খুতবাও তারা এটাকে ভিত্তি করেই প্রস্তুত করে থাকেন।

এরপর কয়েকজন পাঠক-পাঠিকা আলোচনাগুলোকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে পীড়াপীড়ি করেন। তাই আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করে তা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমার একান্ত সুহৃদ মাওলানা উসামা সরওয়ানাবি হাফি. উক্ত বিষয়গুলো পুনঃপর্যবেক্ষণ করেছেন। উদ্ধৃতিগুলোও গুরুত্ব দিয়ে খুঁজে এনেছেন। কম্পোজের পর প্রুফ দেখার কাজটিও তিনি করেছেন। এসব পর্যায় পেরিয়ে এখন গ্রন্থটি আমার মুহসিন ভাই-বোনদের সামনে পেশ করা হচ্ছে।

কিতাবটি অধ্যয়নের পূর্বে সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাকে একটি বিষয় গুরুত্বের সাথে মস্তিষ্কে ধারণ করতে হবে। আর তা হল, নবুওয়াতপ্রাপ্তির আগে এবং পরে আমাদের নবিজি সা.-এর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য দিক ছিল, তার অনুপম চরিত্র। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা যার সাক্ষ্য দিয়েছেন এভাবে,

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ.

নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত।[১]

তিনি কতটা উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, আমরা তার অনুমান করতেও অক্ষম। তিনি নিজে যেমন উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, তেমনি উম্মতদেরও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়াকে পছন্দ করতেন। এ কারণেই তিনি উন্নত চরিত্র গঠনের ব্যাপারে যতটা গুরুত্ব দিতেন, অন্য কোনো বিষয়ে ততটা গুরুত্ব দিতেন না। এক হাদিসে নবিজি সা. ইরশাদ করেন, 'আমাকে পাঠানো হয়েছে উন্নত চরিত্রের পূর্ণতা প্রদান করতে।'

সহিহ বুখারির এক বর্ণনায় রয়েছে, নবিজি সা. ইরশাদ করেন, 'মুমিনদের মধ্যে পূর্ণ ঈমানের অধিকারী ব্যক্তি হল সে, যার চরিত্র সুন্দর।'

হজরত আবু দারদা রা. বর্ণনা করেন, আমি নবিজি সা.-কে বলতে শুনেছি, কেয়ামতের দিন মানুষের আমলনামায় সুন্দর চরিত্রর চেয়ে অধিক ভারী কিছু পাওয়া যাবে না।

---

১. সুরা কলম, ৪

হজরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, আমি নবিজি সা.-কে বলতে শুনেছি, 'অনুপম চরিত্রের মাধ্যমে মুমিন বান্দারা রোজাদার ও রাত জেগে ইবাদতকারী ব্যক্তিদের মত মর্যাদা লাভ করবে।'

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! একদিকে নবিজি সা.-এর বাস্তব জীবন ও চরিত্রের ব্যাপারে তার গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা রাখুন, এবং অপরদিকে বর্তমান মুসলিম সমাজের চারিত্রিক অধঃপতন ও অবক্ষয় দেখুন। বাস্তবতার দৃষ্টিতে তাকালে উভয়টার মাঝে কোনো মিল খুঁজে পাবেন না। অথচ আমরা মনে মনে ভাবি, আমরা সারা পৃথিবী জয় করব এবং অন্যরা আমাদেরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা উন্নত চরিত্রে সজ্জিত না হব, ততক্ষণ পর্যন্ত এমন হওয়া সুদূর পরাহত ব্যাপার।

স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাত্রা, রাজনৈতিকভাবে উৎকর্ষ সাধন করা এবং সামরিক উন্নতি; সবকিছুই বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। কিন্তু আমি মনে করি, আন্তর্জাতিকভাবে পৃথিবীতে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরতে এবং ইসলাম প্রচারের গতিকে ত্বরান্বিত করতে মুসলমানদেরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত তাদের নিজেদের কাজকর্ম, উন্নত চরিত্র এবং পারস্পরিক লেনদেনকে।

যদি এ গ্রন্থটি পাঠক-পাঠিকাদের হৃদয়ে ইসলামি চরিত্রের গুরুত্ব সৃষ্টি করতে সফল হয়, তাহলে লেখক মনে করবে, তার সাধনা যথাযথ হয়েছে।

পরিশেষে একটি কথা না বললেই নয়, আর তা হল, এই গ্রন্থটি হুবহু 'নাজরাতুন নাইম' গ্রন্থের অনুবাদ কিংবা সারাংশ নয়। আর আমার পক্ষে তা করা সম্ভবও ছিল না। বরং তার আলোচ্য বিষয়কে নিজের ভাষায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি মাত্র। অন্তত বিশটি বিষয়বস্তু এমন রয়েছে, যা 'নাজরাতুন নাইম' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়নি, বরং তা নিজের পক্ষ থেকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে লেখার চেষ্টা করেছি। আল্লাহ তাআলা যেন এই অধমের প্রচেষ্টা কবুল করেন এবং এটিকে সবার জন্য উপকারী বানিয়ে দেন। আমিন।

বিনীত
মুহাম্মাদ আসলাম শেখোপুরী

# সম্পাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রবের, যিনি মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' তথা সৃষ্টির সেরা হিসেবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তিনি কুরআনে ঘোষণা করেছেন :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ.

নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সুন্দরতম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি।[২]

এই সৌন্দর্যের অর্থ কী? শুধুই বাহ্যিক চেহারা-সুরত সুন্দর হওয়া? না, এই সৌন্দর্য কেবল বাহ্যিক রূপে নয়, বরং প্রকৃত সৌন্দর্য নিহিত থাকে মানুষের চরিত্রে। চরিত্র যদি কলুষিত হয়, তবে রূপ-ঐশ্বর্য সবই অর্থহীন হয়ে যায়। আর চরিত্র যদি সুন্দর হয়, তাহলে বাহ্যিক রূপ যেমনই হোক-না কেন, সেই মানুষটা দামি হয়ে যায়।

আজকের সমাজে আমরা যে গভীর সংকটের মুখোমুখি, তার মূল কারণ হলো চরিত্রের অবক্ষয়। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সম্পদ—সব কিছু থাকলেও যদি মানুষের চরিত্রে সততা, লজ্জাশীলতা ও আমানতদারিতা না থাকে, তবে সে তার মানবিক মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আমি তো প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্য।[৩]

এই হাদিসই প্রমাণ করে, নবিজির মিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মানবচরিত্রের সংশোধন ও উৎকর্ষ সাধন।

'কুরআন ও হাদিসের আলোকে যেভাবে করবেন চরিত্র সংশোধন' বইটি হাতে নিলে পাঠক খুঁজে পাবেন আত্মশুদ্ধির দিকনির্দেশনা, আচরণ সংশোধনের উপায়, আর অন্তরের রোগ নিরাময়ের উপকরণ। বইটির প্রতিটি অধ্যায়ে ফুটে উঠেছে কুরআনের আয়াত ও হাদিসের আলো। বলা যায়, বইটি পাঠকের সামনে আয়নার মতো প্রতিফলিত হবে, যেখানে সে নিজের দুর্বলতা দেখবে এবং সংশোধনের পথ চিনে নেবে।

---

২. সুরা তিন, ৪

৩. মুসনাদে আহমাদ, ৮৯৫২

এই গ্রন্থের মাধ্যমে যদি একজন পাঠকও নিজের চরিত্রের দুর্বলতা চিনতে পারে, তাওবার পথে ফিরে আসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত আদর্শ চরিত্র অর্জনের চেষ্টা করে, তাহলেই আমাদের এই প্রয়াস সফল বলে গণ্য হবে।

আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, তিনি এই গ্রন্থকে লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, পাঠক ও সম্পাদক, সবার জন্য কল্যাণের উসিলা বানিয়ে দিন। আমাদের অন্তরকে তাঁর নূরের আলোয় ভরিয়ে দিন, আমাদের আমলকে নবিজির চরিত্রের আলোয় রঙিন করে দিন। আমিন

সাজ্জাদ হুসাইন
খেজুরবাগ, কেরাণীগঞ্জ।

# অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসার মালিক মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা। যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, দিয়েছেন সুন্দরতম গঠনপ্রকৃতি, নৈসর্গিক গুণাবলি এবং শ্রেষ্ঠ চরিত্রের মর্যাদা। অসংখ্য দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও মহান সাহাবায়ে কেরামের প্রতি।

প্রিয় পাঠক, ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর মধ্যে আখলাক বা চরিত্র একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ঈমান-আকিদা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি আখলাক-চরিত্রও ইসলামের অপরিহার্য অংশ। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেন এই দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছিল? তিনি নিজেই এর উত্তর দিয়েছেন,

> আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্য।[৪]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম চরিত্রে অনেকে মুগ্ধ হয়েছিলেন। শত্রুতাপূর্ণ পরিবেশেও তাঁরা তাঁর আহ্বান গ্রহণ করেছিলেন। ইসলামের ছায়াতলে এসে তাঁরা সাহাবায়ে কেরাম নামে পরিচিত হয়েছেন। তাঁদের চরিত্র ছিল দীপ্তিময়। পরাশক্তিরাও তার সামনে অসহায় হয়ে পড়েছিল। শত বিরোধিতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তারা সত্য ও শান্তির এ ধর্মকে মেনে নিয়েছিল।

চরিত্র মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। যার চরিত্র সুন্দর, সে সবার কাছে প্রিয় হয়। সম্মান পায়। গর্বের কারণ হয়ে ওঠে। কিন্তু আজকের সমাজের অবস্থা ভিন্ন। চরিত্রবান মানুষের সংখ্যা দ্রুত কমছে। ভালোকে মন্দ বলা হচ্ছে। মন্দকে ভালো বলা

---

৪. আল-আদাবুল মুফরাদ, ২৭৩

হচ্ছে। মনগড়া জীবনধারা সমাজকে কলুষিত করছে। এভাবে চলতে থাকলে মানবসমাজ ধ্বংস হবে। তাই সমাজকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করা এখন খুব জরুরি।

প্রিয় পাঠক, প্রতিটি যুগেই ইসলাম আক্রমণের শিকার হয়েছে। সত্যের প্রান্তরে অন্ধকার নেমে এসেছে। বাতিলরা ইসলামের উজ্জ্বল চরিত্রকে মলিন করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সত্যের আলোকবর্তিকা হাতে মহান মনীষীগণ সে আঁধার ভেদ করেছেন। চরিত্র ও আদর্শের মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য সমাজে প্রতিষ্ঠা করেছেন। রেখে গেছেন কালজয়ী গ্রন্থসমূহ।

সেই ধারারই একজন বিশিষ্ট আলেম ও গবেষক ছিলেন মাওলানা আসলাম শেখোপুরি রহ.। হিন্দুস্তানের অধিবাসী এ মনীষী মানুষের চারিত্রিক অধঃপতনে গভীরভাবে ব্যথিত হয়ে লিখেছেন অনন্য গ্রন্থ *দারসুল কুরআন ওয়াল হাদিস*। যাতে আখলাক-চরিত্রের প্রতিটি বিষয় তিনি সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তারই বাংলা অনুবাদ। অনুবাদের পাশাপাশি কোথাও কোথাও সংযোজন, বিয়োজন ও সম্পাদনার কাজ করা হয়েছে, যাতে পাঠকদের জন্য এটি হয় আরও তথ্যবহুল, উপকারী ও সাবলীল। তবে মানুষ ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমাদের কাজেও কোনো অসঙ্গতি থেকে যেতে পারে। তাই অনুরোধ থাকবে, যদি কোনো সংশোধনী বা পরামর্শ থাকে, তা জানিয়ে আমাদের উপকৃত করবেন।

পরিশেষে, মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করছি, তিনি যেন এই গ্রন্থকে কবুল করেন, উম্মতের জন্য কল্যাণকর বানান এবং লেখক-অনুবাদক-প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এর মাধ্যমে আখেরাতে উত্তম প্রতিদান দান করেন। আমিন।

**মাওলানা ইসমাইল হোসাইন**
শিক্ষক, জামিয়া ইসলামিয়া চরওয়াশপুর মাদরাসা
কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| মিথ্যা | ১৭ |
| শত্রুতা ও বিদ্বেষ | ২০ |
| হিংসা | ২৩ |
| বোকামি | ২৭ |
| খেয়ানত | ৩১ |
| আল্লাহ তাআলার বিধান থেকে বিমুখ হওয়া | ৩৪ |
| লাঞ্ছনা | ৩৮ |
| সুদ | ৪১ |
| ঘুষ | ৪৪ |
| লৌকিকতা | ৪৭ |
| ব্যভিচার | ৫১ |
| জাদু | ৫৫ |
| ঠাট্টা-বিদ্রূপ | ৫৯ |
| চুরি করা | ৬৩ |
| অসন্তুষ্টি | ৬৭ |
| নির্বুদ্ধিতা | ৭১ |
| খারাপ প্রকৃতি | ৭৫ |
| কুধারণা | ৭৯ |
| লালসা | ৮২ |
| মদ্যপান | ৮৫ |
| মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া | ৮৯ |
| তাড়াহুড়া | ৯২ |
| লোভ | ৯৬ |
| দীর্ঘ আশা | ৯৯ |

| | |
|---|---|
| জুলুম | ১০২ |
| পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া | ১০৬ |
| অবাধ্যতা | ১১০ |
| গুনাহের ওপর অটল থাকা | ১১৪ |
| নামাজ ছেড়ে দেওয়া | ১১৮ |
| কুদৃষ্টি | ১২২ |
| অনর্থক খরচ | ১২৪ |
| শিরক | ১২৮ |
| বিদআত | ১৩২ |
| প্রবৃত্তির অনুসরণ | ১৩৬ |
| কৃপণতা | ১৪০ |
| হারাম জীবিকা | ১৪৪ |
| বিদ্বেষ | ১৪৮ |
| গোপন কথা প্রকাশ করা | ১৫২ |
| সন্ত্রাস | ১৫৫ |
| আমল নষ্ট হয়ে যাওয়া | ১৫৮ |
| কাউকে কষ্ট দেওয়া | ১৬২ |
| অশ্লীল কথা বলা | ১৬৬ |
| অন্যের ত্রুটি খোঁজা | ১৬৯ |
| অহংকার | ১৭২ |
| ধোঁকা | ১৭৬ |
| রাগ | ১৭৯ |
| সীমালঙ্ঘন | ১৮৩ |
| গিবত | ১৮৭ |
| আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা | ১৯০ |
| হত্যা | ১৯৩ |
| ক্রীড়া-কৌতুক | ১৯৬ |
| অন্তরের রূঢ়তা | ২০০ |
| প্রকাশ্য গুনাহ | ২০৪ |
| নিরাশা | ২০৮ |
| কুমন্ত্রণা | ২১২ |
| ফিতনা | ২১৬ |

| | |
|---|---|
| মুরতাদ হওয়া | ২২০ |
| সন্দেহ | ২২৪ |
| গোপন ষড়যন্ত্র | ২২৭ |
| অপবাদ | ২৩০ |
| দলগত দুর্বিপাক | ২৩৩ |
| তিন ধরণের মিথ্যা | ২৩৬ |
| প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ | ২৩৯ |
| নিকৃষ্ট উপমা | ২৪২ |
| দুর্ভাগ্য | ২৪৫ |
| সাজসজ্জা প্রদর্শন | ২৪৭ |

# মিথ্যা

মিথ্যা এমন একটি নেতিবাচক চরিত্র, যা ইসলামকে ফোকলা বানিয়ে ফেলে। খুব কম মানুষই তা থেকে বাঁচতে পারে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, মিথ্যা একটি প্রয়োজনীয় ফ্যাশনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। মিথ্যা ছাড়া যেন কোনো কাজই হয় না। বন্ধুত্বও স্থায়ী হয় না, সম্পর্কও উন্নত হয় না। নেতৃত্ব-রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকানপাট সবকিছুই মিথ্যা ছাড়া অচল। ফলশ্রুতিতে সবকিছুতেই আজ মিথ্যার ছড়াছড়ি। অথচ নবিজি সা. মিথ্যাকে মুনাফেকদের অন্যতম একটি নিদর্শন সাব্যস্ত করেছেন। হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সা. ইরশাদ করেন, মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি :

১. কথা বলার সময় মিথ্যা বলবে।
২. প্রতিশ্রুতি করলে ভঙ্গ করবে।
৩. তার কাছে কোনকিছু আমানত রাখা হলে তার খেয়ানত করবে।[৫]

মিথ্যা অনেক বড় অপরাধ এবং কবিরা গুনাহ। এটা মানুষ ও সমাজকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে পৌঁছে দেয়। মিথ্যাবাদী ব্যক্তি ধীরে ধীরে জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আপনজন ও অন্যদের দৃষ্টিতে তাদের কোনো সম্মান থাকে না। কেউ তার ওপর আস্থা রাখতে পারে না। মিথ্যাবাদীর চেহারা থেকে নুর হারিয়ে যায়। বিচক্ষণ মানুষ তার চেহারা দেখেই বুঝতে পারে, এটা মিথ্যাবাদীর চেহারা। পক্ষান্তরে সত্যবাদীর চেহারায় নূরের জ্যোতি ভেসে বেড়ায়, মানুষ তাদের দেখলেই বুঝতে পারে যে, লোকটি সত্যবাদী।

ইহুদিদের অনেক বড় এক পণ্ডিত ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা.। নবিজি সা.-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তার পবিত্র চেহারা দেখামাত্রই তার মন এই সাক্ষ্য দিল যে, এটা কোনো মিথ্যুকের চেহারা হতে পারে না। তিনি তৎক্ষণাৎ ঈমান গ্রহণ করলেন।

ইমাম নববি রহ. বলেন, সাধারণত মানুষ পাঁচটি কারণে মিথ্যা বলে।

---

৫. সহিহ বুখারি, ১/৩৩, সহিহ মুসলিম, ৫৯

১. স্বার্থ হাসিল করতে এবং সমস্যা প্রতিহত করতে। মানুষ মনে করে, মিথ্যা বললে সে উপকার লাভ করতে পারবে আর ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে। ব্যবসায়ী, দোকানী, চাকরিজীবী, দালাল ও উকিলরা সাধারণত এই নিয়তেই মিথ্যা বলে।

২. নিজের কথাকে আকর্ষণীয় করতে। কারণ, সততার মধ্যে স্বাভাবিকতা ও বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটে। কোনো বিষয় বলতে গেলে হু-ব-হু তুলে ধরতে হয়। এতে কারো মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি হোক বা না হোক। পক্ষান্তরে মিথ্যা বলতে এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করতে হয় না। মিথ্যুকরা খুব সহজেই তিলকে তাল বানিয়ে ফেলতে পারে।

৩. পৃথিবীতে এমন মানুষের সংখ্যাও কম নয়, যারা শত্রুতা, ঘৃণা ও হিংসা-বিদ্বেষের কারণে মিথ্যা বলে। শত্রুকে অপবাদ দেওয়া এবং সে যে অপরাধ করেনি, তার দিকে তা সম্পৃক্ত করাকেও তারা বৈধ জ্ঞান করে।

৪. এমন দুর্ভাগা লোকজনও পৃথিবীতে রয়েছে, যারা অসৎসঙ্গ, অসম্পূর্ণ শিষ্টাচার এবং স্বভাবের দুর্বলতার কারণে মিথ্যা বলে। এটা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। সত্যিটা বলতে গেলে কৃত্রিমতার পরিচয় দিতে হয়। কিন্তু মিথ্যা বলতে কৃত্রিমতা দেখাতে হয় না, এমনিতেই তাদের মুখ দিয়ে মিথ্যা বেরিয়ে আসে।

৫. পদের লোভও মিথ্যা বলার অন্যতম একটি কারণ। পদের লোভ মানুষকে মিথ্যা বলতে অনুপ্রাণিত করে। যার মাঝে পদের লোভ রয়েছে, সে নিজের দুর্বলতা কিংবা অজ্ঞতা স্বীকার করে না। মিথ্যার মাধ্যমে হলেও সে অন্যের ওপর ইলমি কিংবা আমলি শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে মরিয়া থাকে।[৬]

কুরআন-সুন্নাহয় মিথ্যুকের যে নিন্দা করা হয়েছে, তা যদি আমরা গভীরভাবে দেখি, তাহলে মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। কুরআনুল কারিমের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মিথ্যা বলা কাফের, ইহুদি ও মুনাফেকদের স্বভাব। মুসলমানদের জন্য তা গ্রহণ করা কতই-না নিন্দনীয়! কাফেররা আল্লাহর নবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। অথচ তারাই ছিল মিথ্যাবাদী।

ইহুদিরা বলত, আমাদেরকে এই বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, আমরা কেবল আমাদের ওপর অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি ঈমান আনব। অথচ তাদের এই দাবি ছিল বাস্তবতা বিরোধী। মুনাফেকরা মুখে মুমিন হওয়ার মিথ্যা দাবি করত। কিন্তু এই দাবিতে তারা ছিল পুরো মিথ্যাবাদী। নবিজি সা. হাদিসে মিথ্যা বলার নিন্দা এবং তা পরিহার করার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন। এখানে আমরা কতিপয় হাদিস তুলে ধরছি।

---

৬. আয-যারিআহ, ২৭৫

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবি করিম সা. বলেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকে, সে খাঁটি মুনাফেক। যার মধ্যে এর কোন একটি স্বভাব থাকবে, তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফেকের একটি স্বভাব থেকে যায়।

১. আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে
২. কথা বললে মিথ্যা বলে
৩. চুক্তি করলে ভঙ্গ করে এবং
৪. বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল গালি দেয়।[৭]

হজরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, আমি জান্নাতের কিনারায় একটি ঘরের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি সেই ব্যক্তির জন্য, যে ঝগড়া পরিহার করবে, যদিও সে সঠিক থাকে। আমি জান্নাতের মধ্যভাগে একটি ঘরের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি সেই ব্যক্তির জন্য, যে মিথ্যা বলা বন্ধ করবে, যদিও তা মজাচ্ছলে হয়। আর আমি জান্নাতের সর্বোচ্চ অংশে একটি ঘরের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি সেই ব্যক্তির জন্য, যার চরিত্র সুন্দর হবে।[৮]

হজরত হাকিম ইবনে হিজাম রা.- এর সুত্রে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসের শেষে নবিজি সা. ইরশাদ করেন, যদি ক্রেতা-বিক্রেতা মিথ্যা বলে এবং দোষ গোপন করে, তবে তাদের ক্রয়–বিক্রয়ের বরকত চলে যাবে।[৯]

হজরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, তিন ব্যক্তির সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা কথা বলবেন না, তাদের গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। এরা হল জিনাকারী বৃদ্ধ, মিথ্যাবাদী বাদশাহ ও অহংকারী দরিদ্র ব্যক্তি।[১০]

বেপরোয়া কিছু লোক রয়েছে, যারা নবিজি সা.এর ব্যাপারে মিথ্যা বলতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। এমন লোকদের সম্পর্কে তিনি বলেন, আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা অন্য কারো প্রতি মিথ্যা আরোপ করার মত নয়। যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করল, সে অবশ্যই তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নিল।[১১]

তাই পাঠক, উক্ত হাদিসগুলো পাঠ করুন এবং নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন পর্যবেক্ষণ করুন। আমরা মিথ্যার বিস্তৃত অঙ্গনে বসবাস করছি। রাজনীতি থেকে ব্যবসা, বিচার বিভাগ থেকে ব্যবস্থাপনা বিভাগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অফিস, শহর থেকে অজপাড়া গাঁ এবং ফ্যাক্টরি-কারখানা থেকে শুরু করে

---

৭. সহিহ বুখারি, ৩৪
৮. আবু দাউদ, ৪৮০০
৯. সহিহ বুখারি, ২০৭৯
১০. সহিহ মুসলিম, ১০৭
১১. সহিহ বুখারি, ১২৯১

সর্বত্র মিথ্যার ছড়াছড়ি। হয়ত এ কারণেই আমরা অভিশাপের মধ্যে রয়েছি। ঘরে শান্তি নেই। রিজিকে বরকত নেই। অন্তরে ঈমানের আলো নেই। পৃথিবীতে আমাদের কোনো সম্মান-মর্যাদা নেই। মিথ্যা বলতে বলতে আমরা আমাদের আস্থা ও বিশ্বাস খুইয়ে বসেছি। সর্বত্র আমাদেরকে দেখা হয় সন্দেহের চোখে।

একটা সময় ছিল এমন, যখন মুসলমানদের ব্যাপারে ধারণা করা হত যে, তারা কখনো মিথ্যা বলতে পারে না। অথচ আজ মানুষের ধারণা হল, মুসলমানরা সত্য বলতে পারে না। ফলে আমাদের প্রকল্প, পানীয়, পোশাক এবং ওষুধের ওপর আমাদের স্বধর্মীয় মানুষই আস্থা রাখতে পারে না। অথচ অন্যদের প্রকল্পকে মানুষ চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মিথ্যা থেকে তাওবা করে সত্য বলার অভ্যাস গড়ে তোলার তৌফিক দান করুন। আমিন।

## শত্রুতা ও বিদ্বেষ

অভ্যন্তরীণ গুনাহসমূহের মধ্যে মারাত্মক একটি গুনাহ হল 'শত্রুতা।' আরবিতে একে বলা হয় 'হিকদ'। আরবি ভাষার প্রখ্যাত ইমাম ইবনে মানজুর রহ. বলেন, 'হিকদ' হল 'কারো প্রতি অন্তরে ঘৃণা ও শত্রুতা লুকিয়ে রাখা এবং প্রতিশোধ নেবার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করা।'[১২]

আল্লামা জুরজানি রহ. বলেন, 'হিকদ-এর মৌলিক অর্থ হল, প্রতিশোধ তালাশ করা। আর তার স্বরূপ হল, কোনো ব্যক্তি তাৎক্ষণিক প্রতিশোধ নিতে অক্ষম হয়ে রাগ সংবরণের ব্যর্থ চেষ্টা করে। কিন্তু তার এই রাগ-ই ধীরে ধীরে শত্রুতার রূপ ধারণ করে।'[১৩]

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন, 'শত্রুতা, অবৈধ রাগ ও হিংসা; সবগুলোই মানুষের অভ্যন্তরীণ কবিরা গুনাহ। এই তিনটি গুনাহ পরস্পরে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং এগুলোর মাঝে একটি বিশেষ বিন্যাসও রয়েছে। রাগের কারণে শত্রুতা সৃষ্টি হয়, আর শত্রুতার কারণে সৃষ্টি হয় হিংসা।'[১৪]

মূলত দুর্ভাগা লোকদের হৃদয়েই শত্রুতার ব্যাধি বাসা বাঁধে। ফলে তারা এই ব্যধির আগুনে দগ্ধ হতে থাকে। এরপর যখন সে দেখতে পায়, তার প্রত্যাশিত নেয়ামতগুলো অন্যরা পেয়ে গেছে কিংবা তার আশান্বিত সম্মান ও মর্যাদার আসনে অন্যরা বসে গেছে, তখন তার হৃদয়ের জ্বলন আরো বেড়ে যায়। এভাবে সে শয়তানের প্রতিনিধি হয়ে যায়। কারণ, শয়তানও মনে মনে অনেক বড় মর্যাদার আসন অলঙ্কৃত করার স্বপ্ন বুনেছিল। এমনকি এটাও সে দাবি করেছিল যে, এ ব্যাপারে অন্য কেউ

---

১২. লিসানুল আরব, ৩/১৫৪

১৩. আত-তারিফাত, ৯৫

১৪. আয-যাওয়াজির, ১/৫২

তার চেয়ে অধিক উপযুক্ত না। কিন্তু এই সম্মান যখন তার পরিবর্তে মাটির তৈরী মানুষ লাভ করল, তখন সে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল আর শপথ করে বসল যে, আমি মানুষ থেকে অবশ্যই এর প্রতিশোধ নেব। আমি যেমন হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হয়েছি, মানুষকেও সেভাবে হেদায়েত থেকে বঞ্চিত করব। শয়তান আল্লাহ তাআলার কাছে কেয়ামত পর্যন্ত জীবনের অবকাশ চেয়েছিল কেবল মানুষকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য; তাওবার জন্য না, আখেরাতকে সাজাবার জন্যও না।

শত্রুতা মূলত সেই শয়তানি আগুন, যা সব শত্রুতা পোষণকারীর অন্তরে জ্বলতে থাকে। অনেক মানুষ এমন রয়েছে, শয়তান যাদের হাজার চেষ্টা করেও মূর্তিপূজায় লিপ্ত করতে পারে না। কিন্তু তাদের এসব মারাত্মক গুনাহে লিপ্ত রাখে। মানুষকে এসব গুনাহে লিপ্ত দেখে শয়তানের আনন্দের কোনো শেষ থাকে না। বিশেষত, যখন তাদের মাঝে বিদ্বেষ, হিংসা, শত্রুতা ও ঘৃণার আগুন জ্বলতে থাকে, তখন তো সে খুশিতে পাগল হয়ে যায়। সে খুব ভালো করেই জানে যে, এই আগুন তাদের মর্যাদা, পূর্ণতা, পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনসহ সবকিছুকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে। যদি কেউ শত্রুতার আগুন অন্তরে ধারণ করে মারা যায়, তাহলে সে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। একমাত্র নিরাপদ অন্তরের অধিকারীরাই ক্ষমাযোগ্য সাব্যস্ত হবে। নিরাপদ অন্তরের অধিকারী তারাই, যাদের অন্তর ঘৃণা ও শত্রুতা থেকে মুক্ত থাকে, যারা দুনিয়াতে অন্য কারো নেয়ামত দেখলে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও সিদ্ধান্তে পরিতুষ্ট থাকে এবং কারো কোনো কষ্ট দেখলে অস্থির হয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলা সুরা বাকারার ২০৪ ও ২০৫ নং আয়াতে এই রোগের তিরস্কার করেছেন।

হাদিসেও এই মারাত্মক রোগের তিরস্কার করা হয়েছে। হজরত আবু সালাবাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সা. ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ তাআলা মধ্য শাবানের রাতে বান্দাদের অভিমুখী হন। মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দেন, কাফেরদের সুযোগ দেন এবং শত্রুতা পোষণকারীদের শত্রুতা থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত সুযোগ দেন।'[১৫]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সা. ইরশাদ করেন, যাদের মাঝে তিনটি রোগের কোনোটিই নেই, আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন।

১. যার মৃত্যু এমন অবস্থায় হবে যে, সে আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করেনি।
২. সে জাদুকর নয় যে, অন্যান্য জাদুকরদের পেছনে পড়ে থাকে।
৩. যে আপন মুসলিম ভাইয়ের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ রাখে না।[১৬]

---

১৫. আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব, ৩/৪৬১

১৬. আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব, ৩/৪৬১

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, আমি নবিজি সা.-কে বলতে শুনেছি যে, চোগলখুরি ও শত্রুতা মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। কোনো মুসলিমের অন্তরে কখনো এ দুটি বিষয় একত্রিত হতে পারে না।[১৭]

সাহাবায়ে কেরাম রা. নিজেদের অন্তরকে সর্বদা শত্রুতা ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত রাখতেন এবং এটিকে নিজেদের জন্য অনেক বড় সওয়াবের কাজ মনে করতেন। হজরত যায়েদ ইবনে আসলাম রা. বলেন, হজরত আবু দুজানা রা. অসুস্থ হলে আমি শুশ্রূষার জন্য তার কাছে যাই। গিয়ে দেখি আনন্দে তার চেহারা ঝলমল করছে। একজন তার আনন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি আল্লাহ তাআলার কাছে দুটি আমল গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে অধিক আশাবাদী। একটি হল, আমি নিজেকে সর্বদা অনর্থক কথা থেকে বাঁচিয়ে রাখতাম। আরেকটি হল, সকল মুসলমানের ব্যাপারে আমার অন্তর সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন। কারো প্রতি আমার কোনো ঘৃণা কিংবা শত্রুতা নেই।[১৮]

বাস্তবতা হল, শত্রুতার ভেতর পরকালীন ও জাগতিক ক্ষতি এত অধিক পরিমাণে বিদ্যমান যে, একজন বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ সর্বদা নিজেকে সেই ক্ষতিকর রোগ থেকে বাঁচাতে সচেষ্ট হবে। আসুন, সেই ক্ষতিকর দিকগুলো কী কী, তা দেখে নিই :

১. শত্রুতা পোষণকারীর সারাটি জীবন অত্যন্ত দুঃখে-কষ্টে পার হয়। সে কখনো সুখ-শান্তির ছোঁয়া পায় না।
২. শত্রুতা একটি আত্মিক ব্যাধি। এর কারণে ঈমান চলে যাওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে।
৩. শত্রুতা একটি শয়তানি ধোঁকা। এই ধোঁকায় পড়তে পারে কেবল বোকারাই।
৪. শত্রুতা পোষণকারী ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ক্রোধের পাত্র হয়। দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়।
৫. শত্রুতা পোষণকারী ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়। সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। তার অন্তর হয় সংকীর্ণ। মস্তিষ্ক হয় ঘোলাটে। সে তাকদিরের প্রতিও অসন্তুষ্ট হয়ে যায়।
৬. শত্রুতার কারণে পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভালোবাসা শেষ হয়ে যায়। মতবিরোধ দেখা দেয়। এমনকি পরিস্থিতি কখনও হত্যাযজ্ঞ পর্যন্ত গড়ায়।
৭. শত্রুতা মানুষের সকল দোষ প্রকাশ করে দেয়। সাথে সাথে তার ভেতর লুকিয়ে থাকা রূঢ়তাও বেরিয়ে পড়ে।[১৯]

---

১৭. আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব, ৩/৪৯৭, ৪৯৮
১৮. নুজহাতুল ফুজালা, ১/৪২
১৯. নাজরাতুন নাইম, ১০/৪৪৪০